



গণতন্ত্র ও মুদ্রণ অঙ্গঙ্গি সম্বন্ধে
যুক্ত। সুনাগরিক গড়ে তুলতে
জনগণের হাতে বই তুলে
দেওয়া দরকার। পুঁথির যুগে
এটা সম্ভব ছিল না। বইয়ের
মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবনার
সংমিশ্রণে ব্যক্তিগত ধারণা ও
বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যেসব
নাগরিক নিজস্ব সৃষ্টিভিত্তি
মতবাদের ওপর আত্মবিশ্বাস,
তঁরাই গণতন্ত্রের সম্পদ। আর
এ রকম নাগরিক পেতে হলে
দেশের লোকের হাতে বই দিতে
হবে, অনেক বই বিভিন্ন
বিষয়ের এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ
থেকে লেখা বই। শুধু বই নয়,
পত্রপত্রিকাও। বইয়ের বিকল্প
যদিও বা পুঁথির মধ্যে সামান্য
কিছু পাওয়া যায়, পত্রিকার
প্রভাবশালী জগৎ একান্ত
মুদ্রণযন্ত্রের সৃষ্টি



সুভাষ সিংহ রায় ▽

অমর একুশে গ্রন্থমেলা

মুদ্রণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দান হলো জ্ঞানের মুক্তি। মুদ্রণপূর্ব যুগে জ্ঞানের একমাত্র উপকরণ কয়েকটি পুঁথি কয়েকজনের করায়ত্ত ছিল। তাঁরা ছিলেন বিদ্যার পুঁজিপতি। শিষ্য গুরুকে সম্বোধন করতে না পারলে বিদ্যা লাভ করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের জাত বিচার করা হতো। পড়াশোনার অধিকার যারা পেত তাদেরও অবোধে পুঁথির ব্যবহার করতে দেওয়া হতো না। গুরু পড়ে যেতেন, শিষ্যরা শুনে মুখস্থ করত। এই ছিল সাধারণ রীতি। গুরুর অনুমতি ছাড়া পুঁথি কেউ নকল করে নিতে পারত না এবং এই অনুমতি ছিল দুর্লভ। মিথিলা থেকে ন্যায়ের পুঁথি নকল করে আনার অনুমতি না পেয়ে ন্যায় শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে মিথিলা হীনপ্রভ হয়ে পড়ল, খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল নবমীপের। সবার কাছে যদি পুঁথি সহজলভ্য হয়, তাহলে জ্ঞানের রাজ্যে গুরুর আধিপত্য ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমরা জানি, অমর একুশে গ্রন্থমেলা শুধু বইমেলা নয়; বাঙালি জাতির আবেগ, অনুভূতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বাঙালি জাতির গৌরবদীপ্ত বিজয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের প্রতীক। প্রতিবছর ফিরে আসে এই বইমেলা। এই বইমেলা পৃথিবীর আর দুই-পাঁচটি বইমেলায় মতো নয়। আমাদের বইমেলায় ইতিহাস নিয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে। শুধু দেশের মানুষ নয়, প্রবাসী বাঙালিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অর্পণ করে এই বইমেলায় জন্য। পৃথিবীর কোথাও এত দিনব্যাপী বইমেলা হয় না। এবার তো ২৯ দিনের বইমেলা। ১৯৬৭ সাল থেকে যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরিতে বইমেলা হয়। সেই সময়কার এই মেলার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম রওশন আলী। কেননা তিনি টানা ২০ বছর যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন (১৯৫৮ থেকে ১৯৭৮ সাল)। সেই আয়োজনে যশোরের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একদিন করে বইয়ের প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু 'বইমেলা' বলতে যা বোঝায়, বড় পরিসরে জাতীয়ভাবে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে। ইউনেসকো ঘোষিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ১৯৭২ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ঢাকায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় আয়োজন করে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক মরহুম সরদার জয়েনউদ্দীন অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতায় অত্যন্ত সীমিত সম্পদকে পুঁজি করে ঢাকায় প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় আয়োজন করেন। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় গ্রন্থমেলা ও গ্রন্থ প্রদর্শনীর জন্য বার্ষিক এক লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ দুইয়ের সমন্বয়ে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় গ্রন্থমেলা সেগুনবাগিচায় আর্ট কাউন্সিল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে বেসরকারিভাবে বই বিক্রির সূত্রপাত ঘটে অনানুষ্ঠানিকভাবে। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি বিশেষ মাত্রা পায়। এ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম

হয়। মুক্তধারার শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা ওই উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধকালে কলকাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন বইসহ কিছু সদ্য প্রকাশিত বই বাংলা একাডেমির মাঠে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি মহান একুশে মেলা উপলক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি বিশেষ হাসকৃত মূল্যে নিজস্ব বই বিক্রির ব্যবস্থা করে, পাশাপাশি মুক্তধারা, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স এবং দেখাদেখি আরো কেউ কেউ বাংলা একাডেমির মাঠে নিজেদের বই বিক্রির ব্যবস্থা করে। ১৯৭২ কিংবা ১৯৭৩ সালে এ জন্য কোনো স্টল তৈরি হয়নি। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি ১৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু ওই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ওই উপলক্ষে বাংলা একাডেমি তার নিজস্ব প্রকাশিত বই প্রদর্শন ও মুরাল প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রফেসর আবু মহাম্মদ হাবীল্লাহ। ওই গণজমায়েত সামনে রেখে ঢাকার বিভিন্ন প্রকাশক বাংলা একাডেমির পূর্বদিকের দেয়াল বরাবর নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় যে যার মতো কিছু স্টল নির্মাণ করে বই বিক্রির ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৯ সালে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, ইউপিএলের মহিউদ্দিন আহমেদ, আহমেদ পাবলিশিং হাউসের হাজি মহিউদ্দিন আহমেদ, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী, নওরোজ কিতাবিত্তার কাদির খান, খান ব্রাদার্সের ফিরোজ খান প্রমুখ কিছু প্রকাশক বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশে ফেব্রুয়ারি ঘিরে বই বিক্রির আয়োজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে বইমেলায় রূপান্তরিত করার জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক ফজলে রাব্বির কাছে সর্নিবন্ধ অনুরোধ রাখেন। ওই মেলা শেষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাসিক 'বই' পত্রিকার এপ্রিল, ১৯৭৯ সংখ্যায় লেখা হয়: 'এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ২১ দিনের এক গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হলো।'...এবার একুশে উপলক্ষে ঢাকায় গ্রন্থমেলা আয়োজকের মূল উদ্যোক্তা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, সহযোগিতা করেছেন বাংলা একাডেমি এবং স্থানীয় প্রকাশকরা। মেলা শুরু হয় ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে। এদিন সকাল ১০টায় ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুল হালিম চৌধুরী। রোজ বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত লোকজন এসেছে। স্টলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে এবং প্রতি স্টলেই কমবেশি বই বিক্রি হয়েছে। ২২টি স্টল ছাড়াও মেলা প্রাঙ্গণের টেবিল পেতে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শন ও বিক্রির ব্যবস্থা করেছিল উৎসাহী সাহিত্যমোদী তরুণরা। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর ঘোর অমানিশার অন্ধকার নেমে আসে। সংস্কৃতি, রাজনীতি ক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষে তখন বাঙালি-বাংলাদেশি বিতর্ক সোচ্চার। তবে ব্যাপকসংখ্যক তরুণ তখন পক্ষপাত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবাদী চেতনা সৃষ্টি করেননি। একমাত্র

বাতিক্রম ছিল বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রকাশিত সংকলন—'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়'। আজকের সংস্কৃতিসচিব ডাক্তারী মমতাজ সেই সংকলন বিতরণ করতে গিয়ে নেহাত ডায়াগুপে বেঁচে গিয়েছিলেন। আমাদের বইমেলা পাঠক সৃষ্টি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান ২৭ জানুয়ারির আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আমাদের বাংলা সাহিত্যের অন্তত পাঁচ-সাতজন নোবেল পেতেন, যদি ভালো ইংরেজি অনুবাদক হতেন। ১৯২৫ সালে জর্জ বার্নার্ড শ নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পান। তিনি সেই অর্থ ব্যক্তিগতভাবে খরচ করেননি। ওই টাকায় অ্যাংলো সুইডিশ লিটারারি ফাউন্ডেশন গঠন করেন। সেই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সুইডিশ সাহিত্যের ভালো ভালো বই ইংরেজিতে অনুবাদ করা। বাংলা একাডেমি এখন অনুবাদ সাহিত্যের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে অনন্য সৃষ্টি মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ফ্রাঙ্কফোর্টের বইমেলায় গিয়ে ভালো করে বুঝেছি, বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। পৃথিবীর ওই বইমেলায় বাংলাদেশকে 'থিম কান্ট্রি'র মর্যাদা পেতে হবে। তার জন্য দরকার আমাদের সাহিত্যের বড় বড় সৃষ্টি ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিশ্বসভায় উপস্থাপন করা। ইংরেজি পড়া পাঠকের সংখ্যা এখন নেহাত কম নয়। দু-তিন বছর ধরে 'লেট ফেস্টিভাল'-এ পাঠক সমাবেশ বেশ ছিল। এখন অমর একুশের গ্রন্থমেলায় বড় প্রকাশনা ১০০টি বইয়ের মধ্যে ১০টি বই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। আমরা জানি, গণতন্ত্র ও মুদ্রণ অঙ্গঙ্গি সম্বন্ধে যুক্ত। সুনাগরিক গড়ে তুলতে জনগণের হাতে বই তুলে দেওয়া দরকার। পুঁথির যুগে এটা সম্ভব ছিল না। বইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবনার সংমিশ্রণে ব্যক্তিগত ধারণা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়। যেসব নাগরিক নিজস্ব সৃষ্টিভিত্তি মতবাদের ওপর আত্মবিশ্বাস, তাঁরাই গণতন্ত্রের সম্পদ। আর এ রকম নাগরিক পেতে হলে দেশের লোকের হাতে বই দিতে হবে, অনেক বই বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বই। শুধু বই নয়, পত্রপত্রিকাও। বইয়ের বিকল্প যদিও বা পুঁথির মধ্যে সামান্য কিছু পাওয়া যায়, পত্রিকার প্রভাবশালী জগৎ একান্ত মুদ্রণযন্ত্রের সৃষ্টি। সংবাদপত্র দেশ ও পৃথিবীকে আমাদের ঘরের মধ্যে এনে দিয়েছে। বই ও পত্রিকার প্রচার না ঘটলে জাতীয়তাবোধ এবং আন্তর্জাতিক ভাবনার বিকাশ ঘটত কি না সন্দেহ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার গ্রন্থ প্রকাশনা সহজ করার স্বার্থে একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করেছে। একই সঙ্গে সরকার প্রকাশকদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকাশকগণী ও প্রকাশকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক